॥ উলাইচণ্ডী ॥

ছন্দা

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায় ১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে 'হরপ্পা'-র বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা। এই ক্রমে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রকাশিত হল আমাদের দ্বিতীয় প্রয়াস 'উলাইচণ্ডী'।

তথ্যসংশ্লেষ ও লিখন
সৌম্যদীপ ও সৈকত

শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

প্রচ্ছদ
সৌম্যদীপ

আলোকচিত্র
সৈকত

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

"'আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা,—আজ ফুলদোল,—আজ ওলাইচণ্ডী পূজা,'—এ সকল উক্তির মহিমা বা প্রভাব পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই।"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই খেদোক্তি অনুসরণ করে, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে, যদি সব ক-টি উৎসব নয়, শুধু 'ওলাইচণ্ডী' পুজোর অতীত 'মহিমা' বা 'প্রভাব' খুঁজতে হয় তবে ফিরে যেতে হবে দূর অতীতে, সেই শ্রীমন্ত সওদাগরের

উলার চতুঃপার্শ্বস্থ মানচিত্র (রেনেল কর্তৃক অঙ্কিত)

সিংহলযাত্রার কালপর্বে:

বামে শান্তিপুর রহে ডাহিনে গুপ্তিপাড়া।।
উলা বায়্যা যায় খিস্‌মার পাশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে।।

বা পাঠান্তরে:

বামে শান্তিপুর রহে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।।
উলা বাহিয়া যায় কিসিমার পাশে।
মহেশ্বরপুরের নিকটে সাধু ভাসে।।

যাত্রাপথে শ্রীমন্ত গুপ্তিপাড়া-শান্তিপুর হয়ে পৌঁছে যায় উলায় (নদিয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার তাহেরপুর থানার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ যা বর্তমানে বীরনগর নামে পরিচিত)। জনশ্রুতি অনুযায়ী, সেখানে ভাগীরথীর তীরে একখণ্ড শিলা স্থাপন করে মা চণ্ডীর পুজোর প্রচলন করে সে। তারপর থেকে বৈশাখী পূর্ণিমায় উলা বা বীরনগরে উলাইচণ্ডী বা ওলাইচণ্ডীর পুজোর শুরু।

কিন্তু এই ইতিহাস এবং বর্তমান উলা বা বীরনগরের ভৌগোলিক অবস্থানের একটু ফারাক আছে। আগে যে ভাগীরথী উলার পাশ দিয়ে প্রবাহমানা ছিল তা বর্তমানে গতিপথ পালটেছে। কিন্তু 'খিস্‌মা' বা 'কিসমা' গ্রামটি আজও উলা বা বীরনগরের পাশেই বর্তমান। তবে উলার ভৌগোলিক অবস্থানের সাক্ষ্য মেলে স্থানীয় ইতিহাসচর্চার কিছু পুরোনো বইতে। যেমন ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রীকুমুদনাথ মল্লিকের *নদীয়া-কাহিনী*-তে লেখক বলেছেন:

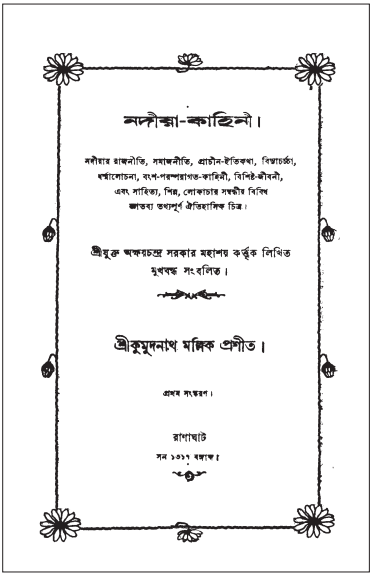
নদীয়া-কাহিনী।

নদীয়ার রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রাচীন-ইতিকথা, বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মালোচনা, বংশ-পরম্পরাগত-কাহিনী, বিশিষ্ট-জীবনী, এবং সাহিত্য, শিল্প, লোকাচার সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক চিত্র।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত মুখবন্ধ সংবলিত।

শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

রাণাঘাট

সন ১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

> এই উলা অতীব প্রাচীন স্থান। প্রাচীন বাংলা গ্রন্থাদিতেও উলার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় ভাগীরথী গঙ্গা এই উলার পার্শ্ব দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছিল। বর্তমান উলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়া ডাকাতের খাল ও বারোমাসে খাল বলিয়া যে অতি প্রাচীন এক গভীর নদীর খাতরূপ নিম্ন জলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে অনুমান করেন উহাই সেই বহুপূর্ব্ব অন্তর্হিত গঙ্গার গর্ভখাত। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৪৬৬ শকে স্বপ্রণীত চণ্ডীগ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন যে, যে সময়ে শ্রীমন্ত

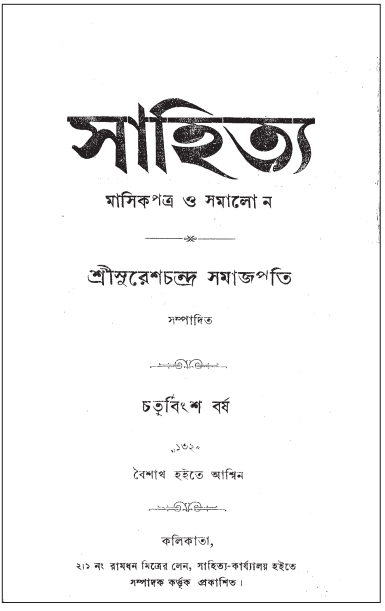
সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

চতুর্বিংশ বর্ষ

১৩২০

বৈশাখ হইতে আশ্বিন

কলিকাতা,

২১৫ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সদাগর পিতৃ উদ্দেশ্যে সিংহল যাইতে ছিলেন তৎকালে তিনি এই উলার নীচে জাহাজ নঙ্গর করিয়া বৈশাখী তিথিতে প্রসিদ্ধ উলাইচণ্ডীদেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

উলায় শৈশববাসের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩২০ সালের ভাদ্র সংখ্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'উলা বা বীরনগর' প্রবন্ধে জানিয়েছেন:

> পূর্ব্বে গঙ্গার খাদ উলার নীচেই ছিল, বর্ষায় সেই খাদে জল আসিয়া উলার তিন দিক প্লাবিত করিত। বৈকালে রাস্তার ধারে তিন চারি শত লোক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিত; সেই এক অপূর্ব দৃশ্য! যে মুহূর্ত্তে যাইবে, তখনই দেখিবে, দশটা পাঁচটা ছিপে মাছ গাঁথিয়াছে।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত *উলা বা বীরনগর* গ্রন্থে শ্রীসৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী বলেছেন, "পুরাকালে উলার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া এবং আংশিক ভাবে উহার পূর্ব প্রান্ত দিয়া পুতঃসলিলা ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল।"

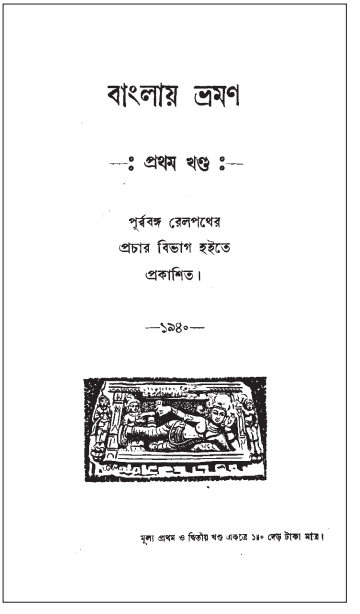

পরবর্তী সময়ে কোনো ইউরোপীয়র লেখায় অথবা মানচিত্রে উলা গ্রামের পাশে ভাগীরথীর অবস্থান না-থাকায় অনেকেই এই মত সম্পর্কে সন্দিহান হলেও বলা যায়, নদী কালের যাত্রাপথে তার নিজ গতিপথও পালটায়, যেমন শান্তিপুরের বাবলায় অদ্বৈতের আশ্রমের কাছ থেকে সরে এসে গঙ্গা আজ শহরের পশ্চিমাংশে প্রবাহিত। কালক্রমিক এই পথ পরিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে শ্রীসৃজননাথ মিত্র তাই তুলে ধরেছেন:

বাংলায় ভ্রমণ

—ঃ প্রথম খণ্ড ঃ—

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের
প্রচার বিভাগ হইতে
প্রকাশিত।

—১৯৪০—

মূল্য প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

> উলার মুস্তৌফীদিগের বংশ বিবরণ হইতে জানা যায় যে তাহাদিগের ও তাহাদিগের জ্ঞাতি উলার ছোট মিত্রদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বাদশাহ সাহজাহার রাজত্বকালে ১৫৭৮ শকাব্দে = ১০৬৩ সনে = ১৬৫৭-৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাহাদিগের আদি বাসস্থান টেকা হইতে উঠিয়া আসিয়া উলা গ্রামে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে কবিকঙ্কনের চণ্ডী রচনার সময় ১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৭/৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উলার পার্শ্বদেশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল।

বটমূলে ভগবতী, যথায় করেন

স্থিতি, উপনীত সেই উলা-ধামে

এর থেকে অনুমান করা যায়, চণ্ডীদাসের কালে গঙ্গার গতিপথ উলার পার্শ্ববর্তীই ছিল এবং কেন ইউরোপীয়দের বোলবোলার যুগে তাঁদের নানা স্মৃতিকথনে বা মানচিত্রে ভাগীরথীর ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে উলা বা বীরনগরের অনুপস্থিত।

'পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত' *বাংলার ভ্রমণ* গ্রন্থেও উল্লেখ আছে: "এক সময়ে ভাগীরথী বীরনগর গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমান বীরনগর গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগ দিয়া ডাকাতের খাল ও বারমেসে খাল বলিয়া যে অতি প্রাচীন এক গভীর জলাভূমি দেখা যায় অনেকে অনুমান করেন যে উহাই ভাগীরথীর প্রাচীন খাত। কবিকঙ্কণের চণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে শ্রীমন্ত সদাগর যখন সিংহলে যাইতেছিলেন তখন উলার নীচে গঙ্গার দহে ভীষণ ঝড় উঠায় তিনি জাহাজ নোঙ্গর করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে উলাই চণ্ডী দেবীর পূজা করিয়া নৌবহর সমেত রক্ষা পাইয়াছিলেন।"

নদীয়া-কাহিনী-তে, কুমুদনাথ মল্লিক উল্লেখ করেছেন "বটমূলে ভগবতী, যথায় করেন স্থিতি, উপনীত সেই উলা-ধামে", কিন্তু প্রকাশিত কোনো চণ্ডীমঙ্গলে এই পাঠ আমাদের নজরে আসেনি, হয়তো নদীয়ায় স্থানীয়ভাবে এই পদের প্রচলন ছিল। কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলে আছে "বামে শান্তিপুর রহে দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।।/উলা বাহিয়া যায় কিসিমার পাশে।"। এর ঠিক আগে আছে গঙ্গার উৎপত্তি কথন, এবং পরে সাগর-বংশ উপাখ্যানে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই উলাসহ সমগ্র নদিয়াতে যে কিছু স্থানীয় সংযোজন থাকবে তা স্বাভাবিক, বিশেষত যখন তা ওলাইচণ্ডীর উৎসবে গাওয়া হবে।

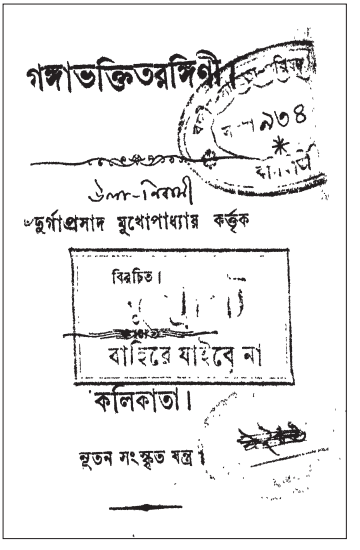

এই সূত্রে বলা যায়, ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ার পরে জন্মগ্রহণ করলেও উলার খড়দাপাড়া নিবাসী কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আনুমানিক ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত *গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী* নামক মঙ্গলকাব্যে উল্লেখ করেছেন উলার গঙ্গাতীরবর্তী অবস্থান ও বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে জাঁকজমক করে বটগাছের তলায় চণ্ডীপুজোর কথা:

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

উলা-নিবাসী

৺দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

বিরচিত।

বাহিরে যাইবে না

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

পাটুলি দক্ষিণে করি,   প্রেমানন্দে সুরেশ্বরী,
নবদ্বীপ সমীপে আইলা,
গঙ্গাকে সারদা কন,   মম ভক্ত বিবরণ,
আছে হেথা বলিয়া চলিলা।
অম্বিকা পশ্চিম পারে   শান্তিপুর পূর্ব্বধারে,
রাখিল দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া,
উল্লাসে উলায় গতি,   বটমূলে ভগবতী,
চণ্ডিকা নহেন যথা ছাড়া।
বৈশাখেতে যাত্রা হয়,   লক্ষ লোক, কম নয়,
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়,
নৃত্যগীত নানা নাট,   দ্বিজ করে চণ্ডীপাঠ,
মানে যে, মানস সিদ্ধ হয়।

কুলীন সমাজ নাম, কিবা লোক কিবা গ্রাম,
কাশীতুল্য হেন ব্যবহার,
দয়া ধর্ম্ম বর্ত্তে যথা, কি কব লোকের কথা,
মুনি যেন, হেন কুলাচার ।

কিন্তু মা চণ্ডী তো 'হাড়ির ঝি'—তিনি অন্ত্যজদের ঘরের মেয়ে, তাদের ঘরেই মায়ের জন্ম—তাই তাদের পুজোর অধিকারই প্রথম। একসময় তারাই মায়ের পুজো শুরু করেছিল, তাদের কৌম বিশ্বাস সংস্কৃতিতে প্লাবিত হত মা উলাইচণ্ডীর থান। মানত করত তারা, মানত পূর্ণ হলে পুজো চড়াত। শ্রীমন্ত সদাগরের গল্পের সঙ্গে মিশিয়ে তাদের দাবি, গহিন জঙ্গলমধ্যে শিলাখণ্ডরূপী মা-কে তারাই পুজো করে চলেছে বহু যুগ ধরে।

বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প গ্রন্থে হীরেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন, "ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, কালিকা পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, দেবী ভাগবত প্রভৃতি কয়েকখানি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণ ও উপপুরাণ ছাড়া না বেদে, না রামায়ণ, মহাভারতে, না বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণের কোথাও চণ্ডীদেবীর নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আর্য-পূর্ববর্তী ধর্মসংস্কৃতি থেকে এঁকে গ্রহণ করা হয়েছে। আরণ্য শবর বা ব্যাধ সংস্কৃতির অধিকারী দ্রাবিড়ভাষী ওঁরাও জাতির উপাস্যা দেবী, এবড়ো-খেবড়ো আকৃতির শিলারূপময়ী চাণ্ডী দেবীর মধ্যে হিন্দু সমাজের চণ্ডী দেবীর উদ্ভবসূত্রের সন্ধান ওই বিশেষজ্ঞরা পেয়েছেন বলে মনে করেন। চাণ্ডী আর চণ্ডী উভয়ের নাম আর আকৃতির মধ্যেই শুধু সৌসাদৃশ্য নয়, বাংলার বহু গ্রামে পূজিত চণ্ডীদেবীর এবং

বীরনগরের উলাইচণ্ডীরও আকৃতি এবড়ো-খেবড়ো শিলাখণ্ডের মতো। [...] শিকারজীবী ওঁরাওদের বিশ্বাস চাণ্ডী দেবীর প্রসাদেই তাদের ভাল শিকার জুটবে। তাই আদিম প্রথায় তারা চাণ্ডীর পুজো আজও করে শিকারে বেরোবার আগে। আর চণ্ডী দেবীকে নিয়ে রচিত বাংলাদেশের চণ্ডীমঙ্গলেও দেখি ব্যাধ কালকেতু, বনের পশুসমাজই চণ্ডীদেবীর অন্যতম প্রধান পূজারী, এই দেবীরই প্রসাদে কালকেতুর বিপুল ধনার্জন, বিশাল রাজ্যের রাজা হওয়া। শূকর বলি দিয়ে হাড়ি-ডোম প্রভৃতি জাতের লোকদের চণ্ডীপুজোতে দেবীর আদিম উদ্ভব স্তরেরই ইঙ্গিত যেন ব্যক্ত হচ্ছে। বীরনগরের উলাইচণ্ডীর জাত-এ সবার আগে হাড়িদের পুজো এবং তাদের শুকর বলিদানের প্রথা, ওঝা-গুণিনদের 'হাড়ির ঝি চণ্ডী' বলা প্রভৃতি থেকে তথাকথিত অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ জাতির সঙ্গে দেবীর আদিম সম্পর্কই যেন ব্যক্ত হচ্ছে"।

তবু অবস্থান্তরের সঙ্গে-সঙ্গে, কৌমের দাবি হয়েছে গৌণ। সকালের আলো ফোটার আগে, পাখির ঘুম না-ভাঙতেই তাদের হাজির হতে হত উলাইচণ্ডী তলায়, মায়ের পুজো সারতে। পুজো দিত, মানত করত, শুয়োর বলিও দিত মায়ের কাছে। পাছে অস্পৃশ্যতার ধুয়ো তুলে ছোঁয়াছুঁয়ির দোহাই দিয়ে পুজো দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না-হতে তাদের সাত-তাড়াতাড়ি দেবীর থানে যাওয়া। কিন্তু কী করে লোকদেবীর পুজোয় ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্গীয়রা তাদের একচেটে অধিকার প্রতিষ্ঠা করল!

জানা যায়, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় আড়াই হাজার ঘর ব্রাহ্মণকে উলায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ তথ্যের সাক্ষ্য মেলে

অক্ষয়চন্দ্রের লিখনে:

> কথিত আছে যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় উলায় ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের পঁচিশ শত ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। আমি বালক, এ সকল এমন করিয়া তখন বুঝিতাম না, তবে আড়াই হাজার, তিন হাজার ব্রাহ্মণ পংক্তিভোজনে আহার করেন, এমন কথা সর্ব্বদা শুনিতাম।

'পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত' *বাংলায় ভ্রমণ*-এ বলা হয়েছে:

> উলায় পূর্ব্বে কয়েকটি টোল বা চতুস্পাঠী ছিল। এখানকার প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের মধ্যে চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন, সদাশিব তর্কালঙ্কার, শিবশিব তর্করত্ন, ভবানীচরণ ন্যায়ভূষণ, মুকুন্দমোহন ন্যায়রত্ন ও কবি দুর্গাদাস মুখাপোধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। অত্রত্য সারণ সিদ্ধান্তের দুইটি কন্যা সংস্কৃতে গভীর জ্ঞানের জন্য সেকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে পাণ্ডিত্য ও কৌলীন্য গৌরবের জন্য উলা প্রসিদ্ধ ছিল।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'উলা বা বীরনগর' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

> বহুপূর্ব্ব হইতেই উলায় সংস্কৃতচর্চা, স্মৃতি-দর্শনের চর্চা ছিল; আর অনেকগুলি পাঠশালা ছিল। বাঙ্গলায় আবার সমাস-কারক শিখাইতে হয়, তখন লোকের সে জ্ঞান সবেমাত্র হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পিতৃদেব গ্রামমধ্যে বিশেষ চেষ্টা করিয়া এবং কর্তৃপক্ষের সাহায্য লইয়া, তিনটি পাড়ায় তিনটি বাঙ্গালা স্কুল ও মাঝের পাড়ায় উপরন্তু একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠাপিত করেন। প্রায় ৬ শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। হরিসঙ্কীর্ত্তন, সাধারণ সঙ্গীত এবং কালায়োতি গানের চর্চ্চাও বিশেষ ছিল। আমি যখন ছিলাম, তখন প্রসিদ্ধ গানবিলাস মহাশয়ের পুত্র হরচন্দ্র বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। দুই জন ব্রজ মুখোপাধ্যায় পাখোয়াজি ছিলেন। ভাল ঢুলী ছিল, ভাল সানাইদার ছিল। বোধ হয়, তাহাদের নাম দীনে ও তিনকড়ি হইবে। ভাল চিত্রকর ছিল, তাহাদের হাতের চিত্র এখনও আমাদের বাড়ীতে আছে। তাহারা উত্তম পুত্তলিকাও তৈয়ার করিত। উলার আচার্যদের ডাকের সাজ প্রসিদ্ধ। ঠাকুর-গড়া কুমার খুব উত্তমই ছিল—বার-ইয়ারির ঠাকুরগুলি কলা-বিদ্যার চূড়ান্ত নিদর্শন। কাঁসারীরা বাসন তৈয়ার করিত, তাহারা দক্ষিণপাড়ায় থাকিত বলিয়া ভালরূপেই জানিতাম। উত্তম ময়রা ছিল; ভাল সন্দেশ হইত। সন্দেশের ঠোঙ্গায় ঘি গড়াইত। তরিতরকারী সমস্তই সুলভ; উত্তম ঘৃত সুলভে মিলিত।”

উলায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনও ছিল বহুকাল আগেই। পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্র ছাপার ‘সমাচার দর্পণ’-এ (১৩ এপ্রিল ১৮২২/ ২ বৈশাখ ১২২৯) সে-সংবাদ ছাপাও হয়েছে:

> "[...] ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন। এবং বীরনগরের শরণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে মুগ্ধবাধে ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। [...]"

এই পরিবর্তিত পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্গীয়দের প্রভাবে উলার তথাকথিত নিম্নবর্গীয়রা সমাজে কোনঠাসা হয়ে পড়ে এবং উলাইচণ্ডীর পুজো ধীরে-ধীরে দোল-দুর্গোৎসব-রথযাত্রার মতো উচ্চশ্রেণির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উৎসবে পরিণত হয়। জমিদার মুখোপাধ্যায়রা এবং সম্ভ্রান্ত মিত্র মুস্তৌফী বংশ নানা পুজোর জমকালো আয়োজনের জন্য বিখ্যাত ছিল। তবে ধনী-দরিদ্র সকলেই বেশ ধুমধামের সঙ্গে বৈশাখী পূর্ণিমার পুজো-উৎসব পালন করত। তাদের অতিথি আপ্যায়নও ছিল সুবিদিত। বৈশাখী পূর্ণিমার দিনই উলায় প্রচলন ছিল বেশ ক-টি বারোয়ারি পুজোর। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্মৃতিচারণাতেও তার সাক্ষ্য মেলে:

> বৈশাখী পূর্ণিমায় উলায় উলুইচণ্ডীর জাত হয় এবং তিন পাড়ায় বারইয়ারি পূজা হইত, এখন দুই পাড়ায় হয়। এই কথা বলিলেই দিনের বিশিষ্টতা বুঝান গেল না। অতি বড় দীনদরিদ্র হইতে ধনকুবেরগণ পর্য্যন্ত সকলেরই বাড়ীতে মহা উৎসব হয়। সকলেই চণ্ডীমায়ের পূজা দেন বা করেন—

সকলেরই বাড়ীতে ভূরি পরিমাণে অতিথি-কুটুম্বের সমাগম হয়।

উলায় থাকাতে পল্লীগ্রামের আতিথ্য জিনিসটা কি, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কাছারীর কাছে আমাদের দোতালা বাসা-বাড়ী ছিল, সেই বাসা হইতেই একটি দরিদ্র প্রতিবাসীর ঘর, দুয়ার, উঠান বেশ দেখিতে পাওয়া যাইত। একটি বাঁশ ঝাড়ের পাশেই তাহাদের ঘর—একখানি, মেটে ঘর, তাহারই দাওয়া, আর বাঁশতলাও যা, উঠানও তাই। ৩।৪ দিন পূর্ব্বে গৃহস্থের পরিবার সেই ঘর দুয়ার বাঁশতলা ঝক্ ঝকে করিয়া নিকাইয়া রাখিত। আর সেই পূর্ণিমার দিনই মেলা হইতে গোটা দুই মাজুরি ও ৩।৪ টা কলিকা ও খানিকটা তামাক কিনিয়া আনিত, আর সেই উঠানের এককোণে বাঁশের গোড়া কাটার আগুন গর্ত্ত করিয়া রাখিয়া দিত। সেই মাজুরিতে বসিয়া, সেই কলিকায় তামাকু খাইয়া কুটুম্ব-অতিথির আনন্দে ভোরপূর হইয়া কতই না গল্প করিত। চণ্ডীমার প্রসাদ নামিলে, এক হাড়ী বা দুই হাড়ী ভাত চড়াইয়া দিত; ৫টা ৬টার সময় সেই প্রসাদান্ন খাইয়া, চাদর বা গামছাখানা কুণ্ডলী করিয়া মাথায় দিয়া লম্বা শুইয়া পড়িত। বলিহারী বাঙ্গলার দীন-দরিদ্র ও বলিহারী বাঙ্গলার আতিথ্য।

কিন্তু উলাইচণ্ডীর কোনো মন্দির নেই। বীরনগরের বর্তমান পৌরসভা ভবনের ঠিক বিপরীতে পূর্বদিকগামী রাস্তার শেষ

প্রান্তে তার থান। সেখানেই বৈশাখী পূর্ণিমায় পুজো হয় বটগাছের তলায়, গাছের ডালে ঝুড়িতে সুতো বেঁধে ভক্তরা নানা মানত করে দেবীর কাছে। আগেও দেবীর থান একই জায়গায় ছিল তা জানা যায় শ্রীসৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফীর রচনা (*উলা বা বীরনগর*) থেকে: "উলার গ্রাম্যদেবতা উলাচণ্ডী দেবী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইনি গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। ইহার কোনো মন্দির বা মূর্তি নাই। ইনি অসমান কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরখণ্ড মাত্র, একটি অতি প্রাচীন ও বৃহৎ বটবৃক্ষের কাণ্ডের পাদদেশে একটি ইষ্টকের বেদির উপরে সিন্দুর রঞ্জিত উক্ত শিলাখণ্ড অবস্থিত আছেন। ইহার নামমাত্র নিত্যসেবা হয়। উলা-চণ্ডী দক্ষিণাস্যা হইয়া আছেন। চণ্ডীতলার প্রাচীন বটবৃক্ষটির শিকড়ে গ্রামবাসীগণ ও দূরদেশাগত ব্যক্তিগণ মনস্কামনা সিদ্ধি ও রোগ শান্তির জন্য ইষ্টকখণ্ড সকল বাঁধিয়া দিয়া মানসিক করিয়া থাকেন। ইহার ফলে উক্ত বটবৃক্ষের শিকড় বা জটাগুলি ইষ্টকের ভারে সত্বর মৃত্তিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক একটি সুবৃহৎ কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে। বৃক্ষের প্রাচীন কাণ্ডটি ও উক্ত প্রকারে নবগঠিত কাণ্ডগুলি যে ভূমিখণ্ডের উপরে দণ্ডায়মান আছে উহার পাদদেশের মাপ কিঞ্চিৎ কম বেশি পূর্ব্ব-পশ্চিম ৬৬ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ৩৮ ফুট। যে উচ্চ মৃত্তিকার স্তূপ বা ঢিপির উপরে প্রধান কাণ্ডটি দণ্ডায়মান আছে, উহার অর্থাৎ বৃক্ষটির মূল কাণ্ডের পাদদেশের ঢিপির পরিধি বা বেড় প্রায় ১৫০ ফুট। বৃক্ষের পাদদেশে যে বেদির উপরে দেবী অবস্থিত আছেন উহার মাপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি, উত্তর-দক্ষিণে ৪ ফুট ২ ইঞ্চি ও উচ্চতা ৩½ ফুট। উক্ত বেদির সম্মুখে সিমেন্ট

দ্বারা বাঁধান পূজারীদিগের যে বসিবার স্থান আছে উহা পুর্ব্বে বৃত্তাকার ছিল, কিন্তু গত ১৩৩১ সালে গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র নিজ ব্যয়ে যখন উহার সংস্কার করেন তখন উহা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর ও চতুষ্কোণ করিয়া প্রস্তুত করা হয়। প্রবাদ আছে যে শ্রীমন্ত সওদাগর দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেন ও নদীয়ার রাজা রাঘবেন্দ্র সর্বপ্রথম ইহার রীতিমত পূজার ব্যবস্থা করেন। ইহার নিষ্কর ভূমি আছে"।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন এই পুজো ছাড়াও বীরনগরে বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষমর্দিনী পুজোও বহু কাল থেকে হয়ে আসছে। এসব পুজো মূলত বারোয়ারি। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই বারোয়ারি পুজোর প্রচলন করেন। সেই উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়েছিল উলা, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি নানা অঞ্চলে। বীরনগরে প্রথমে একটি বারোয়ারি হত। পরে এর সংখ্যা বেড়ে ছ-টি হয়: পালিত পাড়ায় দশভুজা মূর্তি, মুহুরি পাড়ায় দশভুজা মূর্তি, উত্তর পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী মূর্তি, দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দিনী মূর্তি, ডোমপাড়ায় দশভুজা মূর্তি এবং বেলিয়াডাঙা পাড়ায় মহিষমর্দিনী মূর্তি পূজা হত। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন থেকে বারোয়ারিগুলি আরম্ভ হয়ে তিন দিন স্থায়ী হত। এই বারোয়ারি পুজো উপলক্ষ্য করে নাচ-গান-কবিগান-তরজা-ঝুমুর-যাত্রা এবং নানা আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। দুই বারোয়ারির মধ্যে রেষারেষি ও মারামারিও লেগে থাকত। অবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য বারোয়ারি কর্তাদের লাঠিয়ালও রাখতে হত। উলার এই বারোয়ারি খবর প্রকাশিত হয়েছে সেকালের 'সমাচার দর্পণ' সংবাদপত্রেও (৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬):

অনেক২ স্থানে বারএয়ারি পূজা হইয়া থাকে

কিন্তু এইক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না।

২৮ বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাই চণ্ডীতলানামে একস্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দিনী পূজা ও মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গণেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত আপনং২ পাড়ার পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্যন্ত কেহই কসুর করে না তৎপ্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক তামসা দেখিতে আইসে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানহইতে অনেক দোকানি পসারি আসিয়া সেখানে ক্রয় বিক্রয় করে ও অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আর২ প্রকার তামসা অনেক হয়। তিন চারি দিনপর্য্যন্ত সমান লোকযাত্রা থাকে। অনেক২ স্থানে বারএয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না।

উলার দক্ষিণ পাড়া ও উত্তর পাড়া বারোয়ারিতে বহু ধুমধাম হত। তাই নানাভাবে অর্থসংগ্রহ করা হত। ব্রাহ্মণরা ছিল এর পাণ্ডা। এ বিষয়ে নানা গল্পও চালু ছিল। সেসব গল্প সংগ্রহে ছিল সেকালের মানুষজনের। কিছু গল্প রোমন্থন করেছেন সৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার। যেমন, একবার উলার বারোয়ারির পাণ্ডারা চাঁদার জন্য কলকাতার কোনো এক অত্যন্ত কৃপণ বিশিষ্ট ধনীর গৃহে উপস্থিত হন। বারোয়ারির পাণ্ডারা তাঁর কাছে পুজোর জন্য

অর্থসাহায্য চাইলে তিনি তা-তে পাত্তা দিলেন না। তখন পাণ্ডারা তাঁর চারদিকে ঘুরে-ঘুরে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। ওই ধনীর একটি চোখ কানা ছিল ও অন্য চোখেরও দৃষ্টিশক্তি কম থাকায় তিনি চশমা ব্যবহার করতেন। তাই তিনি যখন বিরক্ত হলেন পাণ্ডারা তখন তাঁকে বলে, "আগে আমরা আপনার যে দিকে বসে অর্থ ভিক্ষা চাইছিলাম আপনার সেদিকের চোখ কানা হওয়ায় অলক্ষণ যুক্ত হয়েছে, তাই ওই দিকে বসে ভিক্ষা চাওয়ায় আমাদের অদৃষ্টে কিছুই মিলল না। এবার আমরা আপনার অন্যদিকে বসে ভিক্ষা চাইছি, দেখি যে আপনার এ চোখটি কী লক্ষণযুক্ত আর কিছু ভিক্ষা মেলে কিনা।" তখন সেই ধনী বলেন, তিনি বারোয়ারির জন্য কিছুই দিতে পারবেন না, কারণ তিনি, "বাজে খরচ করেন না।" উত্তরে পাণ্ডারা বলে, "মশাই, আপনি সম্ভ্রান্ত লোক, আপনার মুখে এমন মিথ্যা কথা শোভা পায় না। আপনার যথেষ্ট বাজে খরচ আছে। আপনার চোখ তো একটি, তবে আপনি দুই চোখে চশমা দিয়ে কেন বাজে খরচ করেছেন?" তর্কে হেরে গিয়ে ওই ধনী বারোয়ারির জন্য সেবার যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

আরেকবার, উলার লোকে শুনল, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বজরা করে গঙ্গা দিয়া যাচ্ছেন। তখনই বারোয়ারির পাণ্ডারা ঠিক করেন যে ওই দেওয়ানের কাছ থেকে বারোয়ারির জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে হবে। তারা সদলে নদীর তীরে গঙ্গাগোবিন্দের বজরার সামনে উপস্থিত হয়ে চিৎকার করে বলে "সিংহ কোথায়! সিংহ কোথায়!" এ কথা শুনে চারদিকে শোরগালে পড়ে গেল। গোলমাল শুনে গঙ্গাগোবিন্দ স্বয়ং বজরার বাইরে এসে দাঁড়ান।

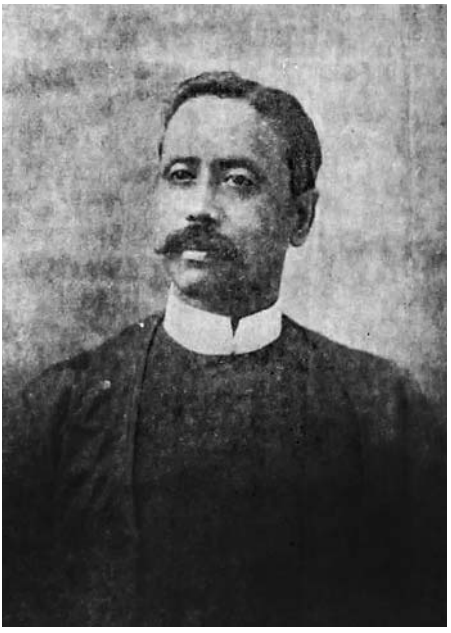

কবি নবীনচন্দ্র সেন

তখন পাণ্ডারা বলে, "সিংহ, আজ আমরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাব। মহামায়া এবার তোমার কাঁধে চেপে উলায় আসবেন, আর তুমি এখানে পালিয়ে এসেছ!" গঙ্গাগোবিন্দ তাদের অভিপ্রায় বুঝে সন্তুষ্ট হয়ে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

উলার সমৃদ্ধি ও গৌরবের এ ইতিহাস কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ম্যালেরিয়া প্রকোপে সমস্ত গ্রামই প্রায় উজাড় হয়ে যায়। জনসংখ্যা তিরিশ হাজার থেকে কমে সাড়ে তিনহাজারে পরিণত হয়। বহু লোক ওই গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তৎকালীন রানাঘাটের মহকুমাশাসক কবি নবীনচন্দ্র সেন উলার সেসব দিনের কথা তাঁর আত্মকথায় 'নদিয়া স্মৃতি' অংশে তুলে ধরেছেন, ততদিনে অবশ্য উলার নাম পরিবর্তিত হয়ে বীরনগর হয়েছে:

> অতএব রানাঘাটে আসিয়া উলা দেখিতে গেলাম। আজ সেই উলার কি অবস্থা! মনে করিয়াছিলাম, কোথায় একটা পাগলাগারদ দেখিব; দেখিলাম

একটি মহাশ্মশান! উলার আর এক নাম বীরনগর। মিউনিসিপ্যালিটির নাম বোধ হয়, উক্ত প্রবাদ স্মরণ করিয়া স্থানবাসীরা 'বীরনগর মিউনিসিপ্যালিটি' রাখিয়াছেন। বীরনগর—এই নামের সার্থকতা কি, তাহা জানি না। উলাবাসীরা বলিলেন যে, একটি রমণী ডাকাতের হস্তে বড় বীরত্ব দেখাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম বীরনগর হইয়াছে। কিন্তু এখন সেই বীরনগরের মহাবীর 'ম্যালেরিয়া'। সেই উলা ম্যালেরিয়ার রণভূমি। উলার জনসংখ্যা এক সময়ে ৩০,০০০ সহস্রেরও অধিক ছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে আজ উলার জনসংখ্যা ৩,৫০০ মাত্র। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও শিবালয় জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত উলা আজ একটি মহাবন। বনের অন্তরালে এখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড বসতির স্থান। মিউনিসিপ্যালিটি না থাকিলে রাস্তাগুলিও বনদেবী গ্রাস করিতেন।

উলার এই মারি-বিধ্বস্ত রূপ ফুটে উঠেছে কেদারনাথ দত্তের *বিজনগ্রাম* কাব্য মধ্যেও:

...জনশূন্য কত
পড়ি' আছে অট্টালিকা দেখি শত শত,
নাহি আছে রুদ্ধদ্বার; পথের ভিতরে
পড়ি' আছে মৃতকায়া, লোকাভাব—তরে
না হয় সৎকার শব। নিরানন্দময়
হইয়াছে এবে সেই সুখের আলয়!!

ততক্ষণাৎ সন্নিপাত সঙ্গে দিয়া

ধর্ম্মরাজের নিকটে পাঠাইতেছে

ম্যালেরিয়ায় উলা গ্রাম জনশূন্য হলেও নানা মারণ রোগের ভয় তার অনেক আগে থেকেই গ্রাম বাংলায় ছিল। যেমন কলেরা বা ওলাউঠা। উলা বা বীরনগর কলেরা-প্রবণ অঞ্চলের মধ্যেই ছিল। এর সাক্ষ্য মেলে সেকালের সংবাদপত্রে (২২ ডিসেম্বর ১৮২৭। ৮ পৌষ ১২৩৪):

> শুনা গেল যে উলাগ্রামে প্রাণনাশক গুণধাম ওলাওঠা সংপ্রতি তথায় অবস্থিতি করিয়া অনেককে কাতর করিয়াছেন তাঁহাকে কাতর করিবার নিমিত্তে কবিরাজসকলে সন্ধান করিতেছেন কিন্তু সে সন্ধান বলবান না হইবাতে ঐ ওলাওঠা ঐ চিকিৎসকদিগকে ঠাট্টা করিতেছে আর যাহার নিকট ঐ রোগরাজ বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে ততক্ষণাৎ সন্নিপাত সঙ্গে দিয়া ধর্ম্মরাজের নিকটে পাঠাইতেছেন।

ওলাওঠার উপদ্রব ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলা তথা ভারতে এবং গোটা বিশ্বজুড়ে। ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছিল প্রচুর। ধর্মভীরু বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ঐশী আশ্রয়ের দ্বারস্থ হয়েছিল। তারা পুজো শুরু করে ওলাইচণ্ডীর ও ওলাবিবির। গ্রাম-শহরে গড়ে ওঠে দেবী ও বিবির থান। কলকাতা শহরও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডের শীতলা মন্দিরে (সাবেক ধর্মঠাকুর মন্দিরে) ওলাবিবির মূর্তি আছে। এমনকি উত্তর-পূর্ব কলকাতার বেলগাছিয়ায় শ্রীশ্রী ওলাইচণ্ডী মা-র খ্যাতি অনেক দিনের। অব্রাহ্মণ দিয়ে ওলাইচণ্ডীর পূজা করা যায়। আর এ থেকে বোঝা যায়, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ কলেরার মতো ভয়াবহ রোগের কাছে অসহায়তা প্রকাশ করেছে।

কলকাতার বেলগাছিয়ায় ওলাইচণ্ডী মা

অনেকের মতে উলা বা বীরনগরের উলাই-চণ্ডীর একপ্রকার নামান্তর হল ওই ওলাইচণ্ডী এবং ওলাবিবি। মনে করা হয়, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদিগুরু আউলেচাঁদের স্মৃতিধন্য (তিনি উলা গ্রামের নিঃসন্তান মহাদেব দম্পতির পালক-পুত্র ছিলেন। তাঁর বাল্যনাম ছিল পূর্ণচন্দ্র। পালক পিতার গৃহে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় এবং পরে তিনি হরিহর ঠাকুরের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।) বীরনগরের উলাইচণ্ডী তলার পাশে পাহাড়পুরের পীরতলায় ছিল ওলাবিবির আদি থান।

কারো মতে, উলায় রোগটি প্রথম দেখা গিয়েছিল বলেই ওলাউঠা (<উলাউঠা) নামকরণ করা হয়েছে। এ যুক্তির বিরুদ্ধ মতাবলম্বিরা দেখিয়েছেন 'ওলা' অর্থাৎ পেট নামা এবং 'উঠা' অর্থাৎ বমি রোগটির অন্যতম উপসর্গ বলে এই নামকরণ হয়েছে।

অপদেবতার প্রভাবে এই রোগের উপদ্রব বলে নিজেদের লোকদেবতার থানে সঁপে দেওয়ার পাশাপাশি ছিল নানা কুসংস্কার। কলেরা বা ওলাওঠা ঠেকাতে যশোরে সর্বনাশা টোটকা প্রয়োগের কথা জানা যায় ১৮১৮-র ২১ নভেম্বর (৭ অগ্রহায়ণ

১২২৫) 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরে। হরিতাল নামে পরিচিত এক প্রকার বিষাক্ত খনিজ পদার্থের চূর্ণ খেয়ে মানুষ কলেরা থেকে মুক্তি পাচ্ছে এমন দাবি করা হয়েছিল সেই সংবাদে:

> যশাহেরে যে২ লোকের ওলাওঠা হইয়াছিল তাহারা হরিতাল ভস্ম ঔ যধি সেবন করিয়া রক্ষা পাইয়াছে এবং যাহারদিগের নাড়ি ত্যাগ ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি মৃত্যুচিহ্ন হইয়াছিল তাহারাও ঐ হরিতাল ভস্ম দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে হিন্দুস্থানিমধ্যে পূর্ব্ব দক্ষিণ উত্তর পশ্চিম যত দেশ প্রদেশ আছে। সম্বৎসরের মধ্যে ওলাওঠা রোগ না হইয়াছে এমত দেশ ও প্রদেশ দেখিলাম না ও শুনিলাম না কিন্তু দেড় বৎসর পর্যন্ত এ রোগ হইয়াছে তথাপি ইহার কারণ কেহ কোন স্থানে নিশ্চয় করিতে পারিল না ইহাতে অনুমান এই হয় যিনি মৃত্যু তিনি অন্ধকার হইতে বিষাক্ত বান নিক্ষেপ করিয়া লোক সংহার করিতেছেন।

খোদ শহর কলকাতাও কলেরা সংক্রান্ত এমন অন্ধবিশ্বাস বা গুজবের বাইরে ছিল না। ১৮১৮-এর ১২ সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণ' জানাচ্ছে, কলেরার 'আসল উৎস' জানিয়ে ইংরেজিতে লেখা এক বাঙালি ভদ্রলোকের চিঠি তাঁদের হাতে এসেছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, কলকাতার লালবাজারের নতুন গির্জার ওপর বায়ুপ্রবাহের দিক নির্ণয়ের জন্য যে হাওয়ামোরগ বসানো হয়েছে, সেটিই আদতে কলেরা-ওলাওঠার প্রকোপের জন্য দায়ী! ওই চিঠিতে লেখা হয়েছিল:

অনেক চিকিৎসকেরা ওলাউঠার কারণ অনুসন্ধান করে তাহাতে কেহ কোন প্রকার ও আর কেহ কোন প্রকার কারণ কহে অতএব যত চিকিৎসক তত কারণ এইপ্রযুক্ত তাহারদিগকে উপহাস করিয়া গত ররিবারের সমাচার পত্রেতে এক দরখাস্ত ছাপান গিয়াছে সে ইংলণ্ডীয় ভাষাতে বাঙ্গালি লোকের লিখনের মত দরখাস্ত। তাহার বিষয় এই কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিতেছে। যে সকল বাঙ্গালিরা বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছে যে লালবাজারের নূতন গির্জা ঘরের উপরে যে মুরগ আছে সেই কেবল ওলাউঠার কারণ। যেহেতুক সে মুরগ যে দিকে আপন মুখ ফিরায় সেই দিকের লোক মরে। এবং সে মুরগ প্রাতঃকালে বড় সাহেবের ঘরের দিকে মুখ করিয়া থাকে বিকালে বড় বাজারের দিকে মুখ করিয়া থাকে। আমার তিন জন আত্মীয় লোক মুরগ দেখিবার কারণ কয়লাঘাটে গেল সেখানে দেখিল যে মুরগ তাহারদের দিকে মুখ করিয়া আছে তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া তথাহইতে পলাইয়া খিদিরপুরে গেল সেখানেও মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তথাহইতে বৈঠকখানাতে পলাইয়া গেল সেখানেও তাহারদের দিকে মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তিন জনের মধ্যে দুই জন বৃদ্ধ ছিল সেই দুই জন আর দৌড়িয়া পলাইতে পারিল না অতএব ওলাউঠা হইয়া সেখানেই মরিল। তৃতীয় জন যুবা ছিল এইপ্রযুক্ত পলাইয়া রক্ষা পাইল।

অতএব সেই মুরগকে যদি হরিণবাটীতে কএদ করা
যায় তবে ওলাউঠা রোগ নিবৃত্ত হয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই কলেরা সম্পর্কে বাঙালির মনে কুসংস্কার ও ভীতির প্রকাশ দেখা গেলেও পরে কলেরার প্রকৃত চিকিৎসা এবং রোগটি সম্পর্কে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য বিষয়ে জানার আগ্রহ একটু-একটু করে সমাজে বাড়তে থাকে। ঔপনিবেশিক সরকারও কলেরা আক্রান্ত স্থানীয়দের চিকিৎসার ব্যবস্থা অল্প হলেও নিয়েছিল। ১৮২৬-এ কলকাতায় বাংলা-হিন্দি-উর্দু এ তিন ভাষায় পারদর্শী পিটার ব্রেটন নামক একজন অভিজ্ঞ ইংরেজ চিকিৎসক কোম্পানির চিকিৎসা বোর্ডের অনুরোধে কলেরা নিয়ে বাংলা ভাষায় *ওলাউঠার বিবরণ* নামক একটি ছাব্বিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। ১৮২৫-এ শহর কলকাতায় কলেরা মহামারির আকারে দেখা দিলে ব্রেটন সাহেবই তাঁর কুড়িজন ছাত্রসহ কলেরা প্রতিরোধে রাতদিন কাজ করেছিলেন। এছাড়াও কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কলেরা নিয়ে ব্রেটনের বাংলায় লেখা পুস্তিকাটি গণবিলি করার ফলে সাধারণ পড়তে-জানা বাঙালির মনে কলেরা ও এর প্রতিরোধ বিষয়ে একটা ধারণা জন্মে। ব্রেটনের কলেরা বিষয়ক পুস্তিকা পড়ে স্বয়ং রামমোহন রায় খুশি হয়ে তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "[ওই পুস্তিকাটি] দেশীয় ব্যক্তিদের নিকট আশীর্বাদ-স্বরূপ।"

তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩-এ 'সাধনা' পত্রিকায় লেখেন 'ওলাউঠার বিস্তার' শীর্ষক প্রবন্ধটি:

ভারতবর্ষ যে ওলাউঠা রোগের জন্মভূমি, এ সম্বন্ধে
সন্দেহ অতি অল্পই আছে। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে এই

ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্‌বিজয় করিতে বাহির হইয়া সিন্ধু, য়ুফ্রাটিস, নীল, দানিয়ুব, ভল্‌গা, অবশেষে আমেরিকার সেন্টলরেন্স এবং মিসিসিপি নদী পার হইয়া দেশবিদেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল।

কিন্তু এই রোগ জল, খাদ্য অথবা বায়ু কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করে এখনও তাহা নিঃসংশয়রূপে স্থির হয় নাই। তবে, জলটাই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রধান বাহন তাহার অনেকগুলা প্রমাণ পাওয়া যায়। মে মাসের নিয়ু রিভিয়ু পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

১৮৪৯ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যখন এই মড়কের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সেখানে সাধারণত টেম্‌স্ নদীর জল ব্যবহার হইত। শহরের নর্দমা এই নদীতে গিয়া মিশিত। সেই সময় দেখা গিয়াছে, নদীর জল শহরের যত নীচে হইতে লওয়া হইয়াছে মৃত্যুসংখ্যা ততই বাড়িয়াছে, এবং শহরের সংস্রবে অপেক্ষাকৃত অল্পদূষিত অংশের জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যাও তত অল্প হইয়াছে।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যে ওলাউঠার মড়ক হয় তখনও এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। লন্ডনে যে দুই জলের কলওয়ালা জল জোগাইয়া থাকে তন্মধ্যে সাউথ্‌ওয়াক্র্ ওয়াটার কোম্পানি

ব্যাটার্সি নামক স্থানের পয়ঃপ্রণালীর নিকটবর্তী টেম্‌স্‌ হইতে জল লইত। এবং ল্যাম্বেথ্‌ ওয়াটার কোম্পানি নদীর অনেক উপর হইতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল আহরণ করিত। লন্ডনের স্থানে স্থানে এই দুই কম্পানির পাইপ সংলগ্নভাবে দুই পাশাপাশি বাড়িতে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ মৃত্যুসংখ্যা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে সাউথ্‌ওয়াক্র্‌ কোম্পানির জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হাজার করা সাতান্ন জন মরিয়াছে আর ল্যাম্বেথ্‌ কোম্পানির জল যাহারা পান করিত তাহাদের মধ্যে হাজার করা এগারো জনের মৃত্যু হয়।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডে সোহোপল্লীর গোল্‌ডন্‌ স্কোয়ার নামক একটি ক্ষুদ্র অংশে ওলাউঠা দেখা দেয়। তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য যে কমিশন বসে তাঁহারা দেখিলেন সেখানে পল্লীর লোক একটি বিশেষ কূপের জল পান করিয়া থাকে। এবং সন্ধানের দ্বারা জানিলেন, মড়কের প্রাদুর্ভাবের প্রাক্‌কালে স্থানীয় একটি নল-কূপ কীরূপে জীর্ণ হইয়া যায় এবং মৃত্তিকাতল দিয়া আবর্জনাপ্রবাহ এই জলের সহিত মিশ্রিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে এই জলাশয় অবস্থিত সেই রাস্তার উপরেই একটি মদ চোঁয়াইবার কারখানা ছিল, সেখানকার কর্মচারীরা উক্ত জল পান করিত না এবং তাহাদের মধ্যে একজনেরও ওলাউঠা হয় নাই।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ডোরান্ডা নামক একটি কুলিজাহাজ ইংলন্ড ছাড়িয়া মাসখানেক পরে জাভাদ্বীপের বন্দরে কয়লা তুলিয়াছিল। সেখানে কোনো মাল বোঝাই হয় নাই, কেবল ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের জন্য ফল এবং শাকসবজি লওয়া হয়। সমস্ত পথ ডিস্টিল্-করা জল ব্যবহার হইয়াছে এবং কোনো বন্দর হইতে জল লওয়া হয় নাই। বন্দর ছাড়ার পর জাহাজে ওলাউঠা দেখা দিল। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের কেহ রোগগ্রস্ত হয় নাই। তাহারাই ফল ও উদ্ভিজ্জ খাইয়াছিল এবং বন্দরে নামিয়া রাত্রিযাপন করিয়া আসিয়াছিল। জাহাজের ডেক্ সাফ করিবার জন্য তীর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বালুকা আনা হইয়াছিল। সেই বালুকা জাহাজের কোনো কোনো বিভাগে দুই দিন ব্যবহার করিয়া দুর্গন্ধবোধে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, জাহাজের লোকের বিশ্বাস সেই বালুকার মধ্যেই ওলাউঠার বীজ ছিল। যদি তাহাই সত্য হয় তবে এ স্থলে জলের দোষ দেওয়া যায় না। বালুকা হইতে বিষ নিশ্বাসযোগে শরীরে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিতে হয়।

'চিকিৎসা-সম্মিলনী' মাসিক পত্রিকায় ১৮৮৮-তে মুদ্রিত হয় 'কলিকাতার কলেরা ও কলের জল', 'কলেরা সম্বন্ধে গুটিকতক কথা' ইত্যাদি অস্বাক্ষরিত (ডাক্তার-সম্পাদক লিখিত) প্রবন্ধ। প্রকাশিত হয় বহু চিকিৎসা বিষয়ক বইও।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বহুসংখ্যক লোক দলে দলে মশাল হস্তে করিয়া নিজ

নিজ বাটীর নিকটবর্তী প্রশস্ত রাজপথে হরিনাম সঙ্কীর্তন করিতেছেন

এ সত্ত্বেও বাংলা অঞ্চলে মহামারিরূপে কলেরার আবির্ভাবের বহু বছর পার হলেও যে রোগটিকে ঘিরে মানুষের অন্ধবিশ্বাসের সমাপ্তি ঘটেনি তার প্রমাণ মেলে ১৮৮২-তে প্রকাশিত 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একটি খবরে। সে-খবর থেকে জানা যায়, ঢাকার গোঁড়া হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা চিকিৎসা বাদ দিয়ে ধর্মচর্চাকেই কলেরা প্রতিকারের উপায় বলে ধরে নিয়েছেন:

> এখনো ঢাকা হইতে ওলাওঠা তিরোধান হইল না। [...] নবাবপুর প্রভৃতি স্থানে উহার প্রকোপ সমধিক পরিমাণেই লক্ষিত হইতেছে; কিছুতেই শান্তি হইতেছে না [...] নবাবপুরবাসীরা গোঁড়া হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী [...] তাহাদের বিশ্বাস, হরিনাম সঙ্কীর্তন ও দেবার্চ্চনা করিলে পীড়ার শান্তি হইবে। বস্তুত নাম সঙ্কীর্তনে উহাদের ওলাভীতি কিয়ৎ পরিমাণে দমিত হইতেছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বহুসংখ্যক লোক দলে দলে মশাল হস্তে করিয়া নিজ নিজ বাটীর নিকটবর্তী প্রশস্ত রাজপথে হরিনাম সঙ্কীর্তন করিতেছেন। [...]

কলেরার এ মহামারি চলেছিল বহুকাল। বঙ্গদেশের সর্বত্রই এর মৃত্যুছায়া ছড়িয়ে পড়েছিল। সংবাদপত্র নয়, আমরা এ রোগের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারি আত্মকথা, কবিতা, গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমেও। উনিশ শতকের শেষে ঢাকায় এই রোগের প্রভাব সম্পর্কে আমরা জানতে পারি দীনেশচন্দ্র সেনের (যাঁর বেড়ে ওঠা ঢাকার সুয়াপুরের পৈতৃক ভিটায়) আত্মজীবনী *ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য*-এর (১৯২২) 'ঢাকায় ওলাউঠা' শীর্ষক অংশে:

১৮৮১ সন। ঢাকায় তখন যেরূপ ওলাউঠার প্রকোপ হইয়াছিল, সেরূপে উৎকট অবস্থা বড় দেখা যায় না। প্রথমতঃ তাঁতীবাজারের পথে যাইতে 'হরিবোল' শব্দে বহু মৃতব্যক্তিকে লইয়া যাইতে দেখিতাম, তখন মড়াটা ডানদিকে কি বামদিকে দেখিলাম, তাহাই লইয়া মনে বিতর্ক করিয়া যাত্রার শুভাশুভ নির্ণয় করিতাম। কচি প্রাণে তখনও ভয়ের সঞ্চার হয় নাই। [...] বাহিরে এই বিক্রম দেখাইয়া মাঝের ঘরটায় একা শুইয়া পড়িলাম। তখন আমার ভগিনী সেখানে ছিলেন না। রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাশের বাড়ীতে উৎকট 'বলহরি' চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ভয়ে আমার ঘুম হয় নাই, একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল মাত্র। আমি সেই তন্দ্রার মধ্যে স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, নেংটি পরিয়া উৎকট শিবনেত্রে, মুণ্ডিত মস্তক দোলাইয়া একটা আঙুল নির্দেশ করিয়া গাঢ় কৃষ্ণ ছায়ার মত উমাপ্রসন্ন আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়াছে ও বলিতেছে 'দীনেশ, চল্ আমার সঙ্গে যাবি?'

নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলাম, আমার সমস্ত শরীর হিমের মত ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে, ভয়ে বাকেরাধ হইয়াছে, হাত-পা নাড়িবার শক্তি নাই। প্রায় আধ ঘন্টা পরে হাতে পায়ে একট শক্তি হইলে আমি হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে নব রায়ের ঘরের দরজায় কড়া নাড়া দিয়া তাঁহাকে জাগাইলাম। তিনি আমার

অবস্থা দেখিয়ে ভীত হইলেন এবং কৈলাসবাবুর ঘরে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিজে শুইয়া পড়িলেন। কৈলাসবাবু দেখিলেন—আমার হাত পা একেবারে ঠান্ডা, আমার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না, জিভটা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে। তিনি লেপ মুড়ি দিয়া আমার হাতে পায়ে নিজের হাত পা ঘষিয়া গরম করিলেন। প্রভাত বায়ূর স্পর্শে আমি যেন নূতন জীবন পাইলাম এবং সেই দিনই সুয়াপুর রওনা হইয়া গেলাম। বুড়িগঙ্গার হাওয়ার স্পর্শে আমার সমস্ত ভয় দূর হইল। পল্লীমায়ের অঞ্চলের বাতাস আমার গায়ে লাগিল।

সুয়াপুর আসিয়া ভয় দূর হইল, খুব স্ফুর্তির সঙ্গে কয়েক দিন কাটিল। পূজার কিছু পূর্বে ঢাকার চিঠিতে জানিলাম, ঢাকার কলেরার প্রকোপ কমিয়াছে। টেস্ট পরীক্ষা নিকটবর্তী, উহা তখন পূজার পূর্বেই হইত। সুতরাং ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে হইল, কিন্তু ঢাকায় আসিয়া কলেরার ভয় আবার আমায় পাইয়া বসিল, 'হরিবোল' শব্দ রাস্তায় শুনিলেই চমকিয়া উঠিতাম, পেটের ভিতর সর্বদাই একটা অসোয়াস্তির ভাব অনুভব করিতাম এবং রোজ সন্ধ্যার পর শুইয়া মনে হইত, সেই রাত্রের কলেরা রোগে মরিয়া যাইব। এই ভয়ে দিনরাত ঔষধ পড়িয়া আমার অনেক আলপাকা ও গরদের জামা জ্বালিয়া গিয়াছে। শুধু সালফিউরিক এসিড নয়, পিপারমেন্ট, বিসমাথ,

ভুবনেশ্বর, ক্লোরোডাইন, স্পিরিট ক্যাম্ফার প্রভৃতি ঔষধ খাইতাম। সালফিউরিক এসিড ডিল পকেটেই থাকিত, শিশির ছিপি খুলিয়া ঔষধ খাইয়া এমনই পেটের অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে প্রায়ই আমার কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকিত। এইভাবে ২/৩ বৎসর ঢাকায় কাটাইয়া আমার শরীর একেবারে মাটি করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভয়-জনিত মস্তিষ্কের বিকার, স্নায়বীয় দুর্বলতার দরুন শিরঃপীড়া ও বাতব্যাধি শেষে আমার জীবনটাকে অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। ঢাকায় তখন জলের কল ছিল না, কূপের জল খাইতে হইত; তাহাতে গলগন্ড জন্মিত এবং সেই জলের গুণে বার মাস কলেরা ঢাকায় লাগিয়াই থাকিত। ঢাকার নামে আমার সেই শৈশবের ত্রাস এখনও আছে। ছোট ছোট দুর্গন্ধ গলি, বৃষ্টি হইলে কলিকাতার গলিতে জল দাঁড়ায়, ঢাকায় সুরকি ও নানা আবর্জনা পচিয়া একটি ক্বাথের মত পদার্থ প্রস্তুত হয়, পদব্রজে চলিলে হাঁটু পর্যন্ত সেই ক্বাথে লিপ্ত হয়। ঢাকায়ই আমার স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য হারাইয়া আসিয়াছি। এখন শুনিয়াছি জলের কল হওয়ায় কলেরা কমিয়াছে কিন্তু অলিগলির নরকে বোধ হয় যমরাজ তেমনই জোরে প্রভুত্ব করিতেছেন।

১৮৮১ সনের কলেরার মহামারীতে আমার অঙ্কের চর্চা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। এন্ট্রান্স

> পরীক্ষায় অঙ্কে তিন নম্বর কম হইয়াছিল, শুনিলাম, তদ্দরুণ ৩০ নম্বর অপরাপর বিষয় হইতে কাটা হইয়াছিল এবং এই জন্য আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ হইয়াছিলাম।

বহুদিন হল ওলাউঠার প্রকোপ দূর হয়েছে। তবে মারি দূর হয়নি এ পৃথিবী থেকে। কোভিড-১৯ নামক এক ভাইরাস ঘটিত রোগের ভয়ে এখন আমরা গৃহবন্দি। বিজ্ঞান সভ্যতা বহুদূর এগোলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি করোনা দূর করতে লোকে আজও যাগযজ্ঞ করছে, গোমূত্র পান করছে। আর বেঘর-বেরোজগার হয়ে পড়ে আছেন শতশত পরিযায়ী শ্রমিক। তবু ভরসা এখনও দেশে শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ বা লালুরা টিকে আছে—তারাই এ চরম দুর্দিনে পাশে দাঁড়িয়েছে নিঃসহায় মানুষগুলোর।

এ অবস্থায় মনে প্রশ্ন জাগছে দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণ' কি আবার 'মর্ত্ত্যে আগমন' করেছেন, নানা জায়গায় রোগ ছড়িয়ে দেওয়ার পর সংক্রামক রোগ কি এবারও বলবে:

> কেবল আমার দ্বারাই বাংলা ধ্বংস হইয়াছে। আমি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুর নামক গ্রামে প্রথম আবির্ভূত হই। তারপর ১৮২৫/২৬ অব্দে যশোহর ও তৎসন্নিহিত অনেকগুলি স্থানের লোককে সংহার করিয়া ১৮৩২/৩৩ অব্দে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করি এবং অনেকগুলি গ্রাম নষ্ট করিয়া ১৮৫৬ সালে উলাতে আসিয়া দেখা দিই। উক্ত নগর ধ্বংস করিয়া ১৮৫৭ অব্দে রাণাঘাটের নিকটস্থ অনেকগুলি গ্রাম নষ্ট করি। তৎপরে ১৮৫৯

> অব্দে কাঁচড়াপাড়ায় উপস্থিত হই। কাঁচড়াপাড়া ধ্বংস করিয়া গঙ্গা পার হই এবং হুগলীর উত্তরপূর্বাংশ ও বারাসত ধ্বংস করিয়া তৎপর ১৮৫৯/৬০ অব্দে শান্তিপুরে শুভাগমন হয়। তথা হইতে ১৮৬৪ অব্দে কৃষ্ণনগরে যাই। ১৮৬৭ অব্দ পর্যন্ত থাকিয়া নগরের এক তৃতীয়াংশ লোক নষ্ট করিয়াছি। ডিঃ গুপ্তর মিক্শ্চার ও সুধাসিন্ধু প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ হইয়া আমার প্রতাপ একটু কমিয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে সামলাইতে লোকের অনেক কাল লাগিবে। এক্ষণে আপনারা যদি বলেন ত পুনরায় একবার কোমর বাঁধিয়া লাগিব।

না, তা আর সম্ভব নয়, জ্বর, হাম জ্বর, বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগেরা বৃদ্ধ হওয়ায় তাদের আগের মতো সামর্থ্য নেই। কিন্তু সেকালের কচি রাজনীতি আজ স্বাধীন ভারতে অভাবনীয় ক্ষমতাবান; সাধারণ শুভচিন্তা বোধ-বুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা সমস্ত কিছুর উপরে তার অবস্থান; তার চতুষ্পাদ দলনে অতিবুদ্ধি জনগণের আত্মহননকারী ধর্মীয় বিভাজনে মনুষত্বের মৃত্যু যে সমাসন্ন তা প্রতিনিয়ত প্রতিভাত হয়ে চলেছে এই দেশে। অতীতে একই কারণে সৃষ্ট ওলাইচণ্ডী আর ওলাবিবির ভক্তগণকে আজকের ভারতবর্ষে করোনা রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির জন্য পরস্পরের দিকে আঙ্গুল তুলে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারছে সেই রাজনীতি। এই লজ্জার থেকে কোনো দেবী বা বিবি আমাদের উদ্ধার করতে পারবেন না। তাই আমাদেরই এই রোগের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে।

উলাইচণ্ডী পুজোর এই দিনে
(২৪ বৈশাখ ১৪২৭)
করোনার আক্রমণে আমরা গৃহবন্দি।
এ অবস্থায় আসুন এই পুজোর
কিছু পুরোনো আলোকচিত্র
দেখে স্মৃতি রোমন্থন করি।

উলাইচণ্ডী পুজোয় জনপ্লাবন

উলাইচণ্ডী পুজোয় জনপ্লাবন

উলাইচণ্ডী পুজোয় মানতের ইট

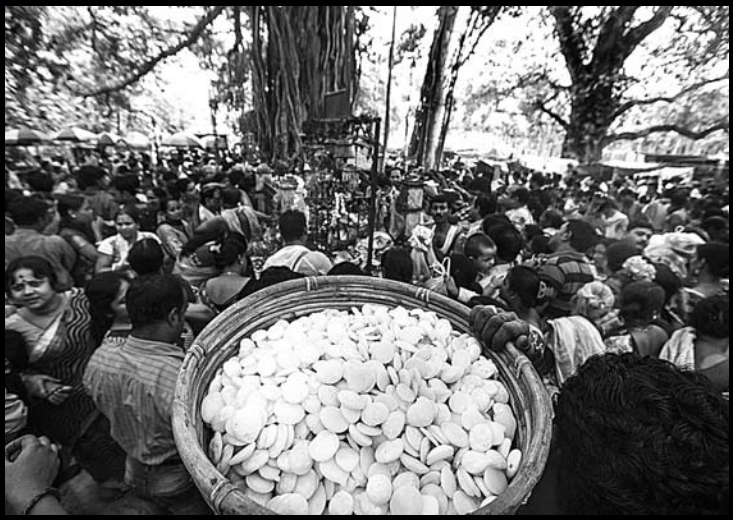

হরির লুঠের বাতাসা

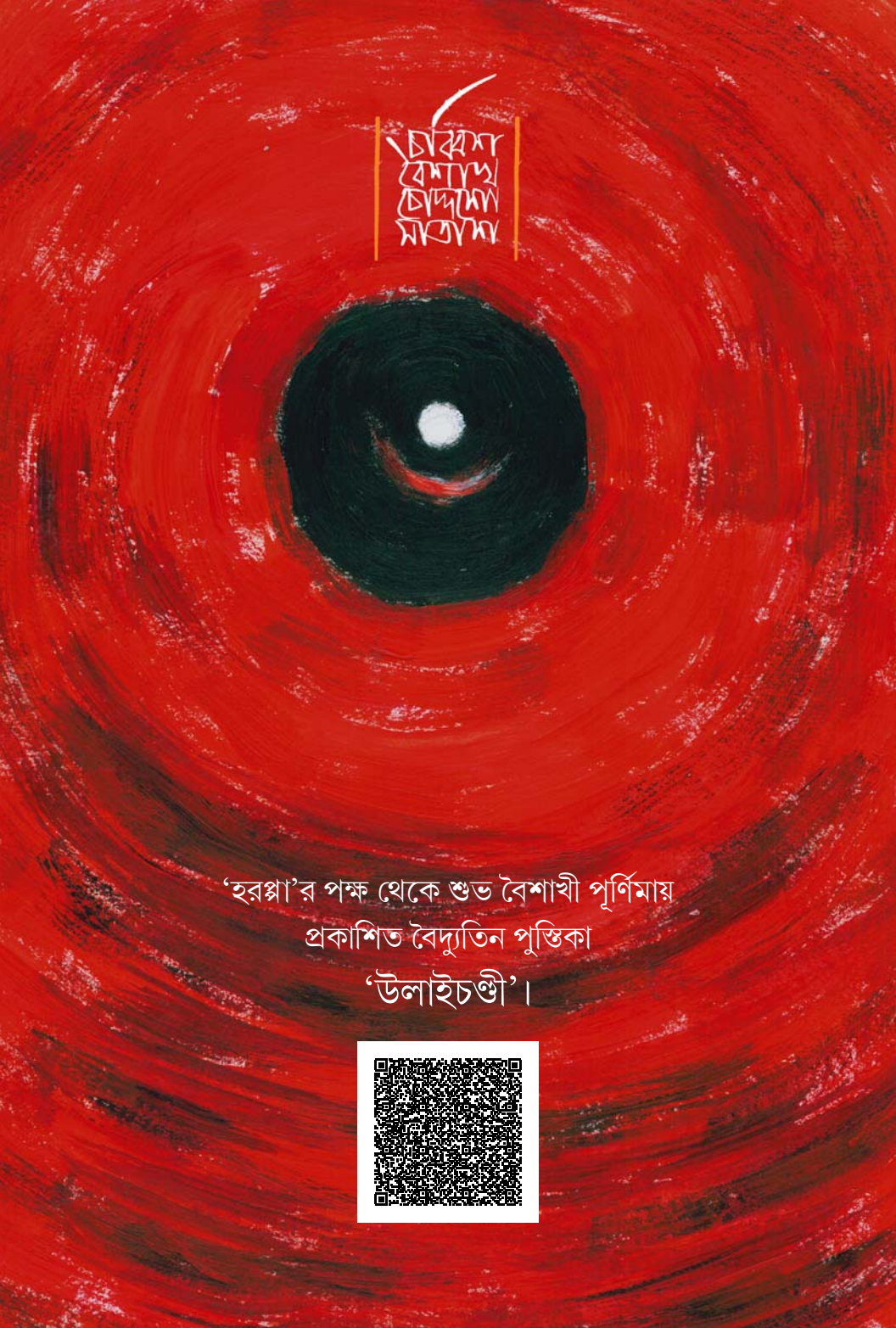

‘হরপ্পা’র পক্ষ থেকে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায়
প্রকাশিত বৈদ্যুতিন পুস্তিকা
‘উলাইচণ্ডী’।